Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আজিজুল হক
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.7
Pages	247-271
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শওকত ওসমানের রূপক উপন্যাস

সৈয়দ আজিজুল হক

শওকত ওসমান (জন্ম ১৯১৭) বাংলা উপন্যাসের ধারায় একজন সমাজ-সচেতন ব্যক্তিত্ব। ইতিবাচক জীবনবোধ, রাজনীতিমনস্কতা ও জন-জীবনসম্পৃক্ত শিল্পদৃষ্টি তাঁর ঔপন্যাসিক সফলতার নিয়ামক উপাদান। বিরুদ্ধ রাষ্ট্রীয় পরিবেশে জীবিকার নিশ্চয়তা-চিন্তা তাঁর সৃষ্টিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল নির্মাণ করলেও তিনি প্রগতিশীল চেতনাকে বিসর্জন দেননি; বরং রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে নির্মম আঘাত হেনেছেন বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতি।

বিভাগ-পূর্ব কালে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের শুরু হলেও বিভাগোত্তর কালই তাঁর সৃষ্টিশীলতার মহত্তম সময়। এ-কালে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনের চরম অগণতান্ত্রিক, অধিকারহীন এক স্বৈরাচারী কলুষময় পরিবেশ---যার প্রতিক্রিয়ায় যে-কোনো সমাজসচেতন স্রষ্টামানসই অত্যন্ত বিরূপ ও তিক্ততায় ভারাক্রান্ত হতে বাধ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে আবাল্য তিনি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তার সঙ্গে পাকিস্তানী শাসন-শোষণের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদী মানসিকতার সংমিশ্রণ তাঁকে রূপক[১] সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

রূপক উপন্যাস রচনায় শওকত ওসমানের সার্থকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও অন্যান্য উপনাসের তুলনায় তাঁর রূপক উপন্যাস-গুলো স্বল্প-আলোচিত। ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬৩), সমাগম (১৩৭৪/১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৩৭৭/১৯৭০) ও পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩) তাঁর রূপক উপন্যাস[২] হিসেবে খ্যাত।

এক

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসটির প্রকাশ-কালে আয়ুব খানের সামরিক শাসন বাঙালীর জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। দেশ বিভাগের (১৯৪৭)

পর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তির পরিবেশ ছিল না। কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকচক্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় বসতে দেয়নি কখনও। পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেই ছিল এক ধরনের ষড়যন্ত্র, যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের সঙ্গে অন্যায় দরকষাকষির মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের ওপর আরোপিত হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভাগোত্তর দশ বছর যে-অস্থিতিশীল বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান ছিল, সেক্ষেত্রে আয়ুবের সামরিক শাসন ক্ষমতার উচ্চস্তরে শৃঙ্খলা ফিরেয়ে আনলেও তা ছিল মূলত একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসন। জনগণের ওপর নেমে এসেছিল নির্যাতন-নিষ্পেষণের সীমাহীন আক্রোশ। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার-সহ সর্ব প্রকার অধিকার হয়েছিল চরমভাবে পদদলিত। বাক্, ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হয়েছিল চরমভাবে। 'ক্রীতদাসের হাসি' আলোচনার সময় আইয়ুবী শাসনের এই স্বৈরাচারী কঠোরতার স্বরূপ বিবেচনায় রাখা প্রাসঙ্গিক।

উপন্যাসে প্রদত্ত লেখকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসটি 'সহস্র ও এক রাত্রি' শীর্ষক কাহিনীর সহস্র-দুই সংখ্যক গল্পের অনুবাদ। বাগদাদের নিপীড়ক খলীফা হারুনর রশীদকৃত অপকর্মের বৈরী স্মৃতিতে দংশিত এক নিঃসঙ্গ মানসিক অবস্থায় যখন শান্তি খুঁজছেন, তখনই তাঁর কানে ভেসে আসে তাঁরই মহলের এক ক্রীতদাস ও বাঁদীর প্রণয়ঘন মধুর মিলনের হাস্যধারা। এই হাসি খলীফার মনে দুই ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে: একটি ঈর্ষামূলক বাসনা, অপরটি প্রতিহিংসা। যেমন:

> আহ্, ঐ হাসি আমি হাসতে পারতাম।[৩]
>
> ওরা হাসবে, আমি হাসতে পারবনা? না, তা হয় না।[৪]

এই দ্বিবিধ প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ: ক্রীতদাস হাবসী তাতারীকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বাগদাদের একটি বাগিচা এবং তার যাবতীয় গোলাম, বাঁদী, মালমাত্তা আসবাব—সবকিছুর মালিক করে দেওয়া হয় এবং আরমানী বাঁদী মেহেরজানকে খলীফা নিজের বেগম করে নেন। মেহেরজান এই ব্যবস্থা মেনে নেয় কিন্তু তাতারী মানতে পারে না।

তাতারী ক্রীতদাসের হাসি যায় বন্ধ হয়ে। ক্রীতদাসের হাসি শোনার জন্য খলীফা প্রথমে তাকে তুষ্ট করার পথ নেন এবং পরে তাতে ব্যর্থ হয়ে গ্রহণ করেন নির্যাতনের পথ। কিন্তু হাসির উৎস যে প্রণয়ী তার বিচ্ছেদে ক্রীতদাসের হাসি যে বন্ধ হয়ে যায় তা খলীফার অন্যতর কোনো ব্যবস্থায়-ই আর ফিরে আসে না। খলীফার দম্ভ ছিল অর্থ দিয়ে সবকিছু সম্পাদন করা যায়---কিন্তু সে দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে অতারী প্রাণ-ত্যাগ করে। এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি। এই উপন্যাস থেকে একটি দার্শনিক মীমাংসা পাওয়া যায়, তা হলো: অর্থ এবং জবরদস্তি দিয়ে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।

খলীফা দম্ভ করে বলেছিল:

> গোলাম আবার হাসবে না? দেখে নিও দীরহাম কি করতে পারে।[৫]

কিন্তু খলীফার সে দম্ভ চূর্ণ করে দিয়ে তাতারী মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলে:

> শোন, হারুনর রশীদ। দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে। বান্দী কেনা সম্ভব—। কিন্তু---- কিন্তু--- ক্রীতদাসের হাসি---না----না---না---না ---[৬]

উপন্যাসের এই কাহিনীতে তৎকালীন পাকিস্তানের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসন খলীফা হারুনর রশীদের শাসনের রূপকে বর্ণিত হয়েছে। ক্রীতদাসের হাসি হয়ে উঠেছে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার রূপক, তাতারী যেন প্রতিবাদী বাঙালী জনগণেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এখানে। অত্যাচারী খলীফার শাসনাধীন বাগদাদকে এই কাহিনীতে অভিশপ্ত নগর হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সারা পাকিস্তানই তখন স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণে অভিশপ্ত। উপন্যাসে বাগদাদ নগরী যেন সমগ্র পাকিস্তানের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত।

এই উপন্যাস পাঠকদের মনে কয়েকটি চেতনার জন্ম দেয়। এক. স্বাধীনতা এবং অধিকারই মানুষের সকল সুখ ও আনন্দের উৎস। এই উৎসকে হরণ করে কারো কাছ থেকে স্বচ্ছন্দ আচরণ আশা করা বৃথা:

> হেকিমী দাওয়াই তৈরী করতে অনেক রকম উপাদান প্রয়োজন হয়। তেমনি হাসির জন্য বহু অনুপান দরকার। হাসি একটা জিনিস। কিন্তু হাসি তৈরী হয় নানা জিনিস দিয়ে। খাওয়া লাগে, পরা লাগে, আরাম লাগে, শিক্ষা লাগে, আরও বহু কিছু। ... ...তার একটা উপাদানের যদি অভাব ঘটে, আর হাসি তৈরী হবে না। ধরুন, সব আছে—নিরাপত্তা নেই। হাসি তৈরী হবে না।[৭]

দুই. পরশ্রমজীবীর তুলনায় শ্রমজীবীর মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ অনেকগুণ বেশি। খলীফা বা বাদশাহ্ পরশ্রমজীবী, স্বীয় শ্রমে উৎপাদিত ফসল তাদের গ্রাসাচ্ছাদন করায় না। ফলে নির্মমতা, ক্রূরতাই তাদের স্বভাব-সঙ্গী। কিন্তু যে-শ্রমজীবী স্বীয় শ্রমে উৎপন্ন ফসল দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে, নির্মমতা ক্রূরতা তার স্বভাবজাত নয়। মানসিক বোধে তার হৃদয় অনেক বেশি জীবন্ত। যেমন: খলীফার নিজেরই স্বীকারোক্তি :

> মশরুর, খেলাফৎ ত পাওনি। বুঝবে না রাজত্বের লোভ কতো। ওই লোভের আগুনের কাছে হাবিয়া-দোজখ সামাদানের ঝিলিক মাত্র। বিবেক, মমতা, মনুষ্যত্ব—সব পুড়ে যায় সেই আগুনে।[৮]

অন্যদিকে, গোলামেরা এমন হাসি কিভাবে হাসতে পারে—খলীফার এই প্রশ্নের উত্তরে মশরুর বলে :

> পারে, আমিরুল মুমেনীন। ওরা সুখ পায় না, কিন্তু সুখের মর্ম বোঝে। মনুষ্যত্বহীন, কিন্তু মনুষ্যত্বের আস্বাদ পায়।[৯]

বাগিচা ও দাসী-বাঁদীর মালিকানা পেয়েও হাবসী তাতারী কেন খুশী হতে পারে না তার যুক্তি হিসেবে সে বলে :

> আমরা অর্থাৎ গোলামেরা নিজের যোগ্যতা আর মেহনৎ দিয়ে কোন জিনিস অর্জন না করলে স্বোয়াস্তি পাই না। যোগ্যতা, মেহনতের বাইরে থেকে হঠাৎ কিছু যদি আমাদের উপর ঝরে পড়ে, তাতে সুখ কোথায়? মগ্‌জ আর তাগদের জোরে কোন জিনিস না পেলে আমরা মজা পাই না।...[১০]

গোলাম তাতারীর চূড়াস্পর্শী মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় মেলে তখনই, যখন খলীফা বাগদাদের শ্রেষ্ঠ নর্তকী বুসায়নাকে তাতারীর কাছে পাঠায় তাকে তুষ্ট করার জন্য। সমস্ত বাগদাদ শহর যার পায়ে মাথা লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত, তাকে প্রত্যাখ্যান করে তাতারী বলে :

> প্রতিদিন কিছু দীরহাম ছুঁড়ে ফেলে, যারা তোমাকে বেইজ্জৎ করে আমি তাদের মত তোমাদের অসম্মান করতে শিখিনি। আমি গোলাম। দীরহাম দিয়ে সবকিছু কেনার পাগলামি থেকে অন্তত আল্লা আমাকে রেহাই দিয়েছেন।[১১]

তাতারী আরও বলে :

> নারীর বিবসনা হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কেবল প্রেমে। নারীর নির্লজ্জ হওয়ার অধিকার আছে। তা-ও শুধু প্রেমে।... তোমার দেহের দিকে তাকাও। ও ত সওদাগরের দোকান, নেশা আর জেওরে (অলঙ্কার) ঠাসা। দীরহাম দিলেই পাওয়া যায়। নারীর মূল্য অত সস্তা নয়---যে-নারী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-জাতির শিশুকে পৃথিবীতে আমন্ত্রণ দিয়ে আনে---যে-নারী শাশ্বত মানবতার জননী---বসুন্ধরার অনন্ত অঙ্গীকার, সে অত সস্তা হয় না, বুসায়না।[১২]

ক্রীতদাসের হাসির প্রসঙ্গ নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনীতে খলীফার অনুচরদের মধ্যে দু'টি পৃথক দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একদল : সংস্কৃতিসেবী, কবি, শিল্পী---যাঁদের বিবেক শুকিয়ে মরেনি অর্থলোভে। অন্যদল অর্থের কাছে তাদের বিবেককে দিয়েছে বিকিয়ে। এই দলে রয়েছে : আলেম আবদুল কুদ্দুস এবং খলীফার উজীর-নাজির ও জল্লাদসহ অন্য সভাসদেরা। অর্থের জন্য তারা খলীফাকৃত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না কখনও। প্রথমোক্ত দলের কবি ইসহাক, আবু নওয়াস প্রমুখ পরোক্ষভাবে একটি জীবনসত্য ব্যক্ত করেছিল যে মেহেরজানের অবর্তমানে তাতারী কোনোদিন হাসবে না। এবং তাতারী কে মিথ্যা অভিযোগে দণ্ড দেওয়ার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল আবু নওয়াস। খলীফার বিচারের ভুল তাঁর কাজী-আমীর ওমারাহগণ কেন দেখতে পায় না---সে প্রশ্নের উত্তরে আবু নওয়াস বলে :

জাঁহাপনা, তারা যখন আপনার চোখ দিয়েই দেখে তখন নিজেদের চোখ ব্যবহার করে না। আর যখন নিজেদের চোখও দেখার কাজে লাগায়, তখন আপনার চোখের ঝিলিক তারা আগেই দেখে নেয়।[১৩]

সবদেশে সবকালেই স্বৈরশাসকদের ঘিরে থাকে এক শ্রেণীর স্তাবক দল, যারা স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কোনো অন্যায় কর্মেরই প্রতিবাদ করে না। আপাতঃদৃষ্টিতে এদের বুদ্ধিমান বলে মনে হয় এবং বিবেকবান; যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তাদের মনে হয় বোকা, কেননা অর্থপ্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত হয়। কিন্তু সাময়িক সুখভোগের লোভ যে সামগ্রিক কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মহত্তর উপলব্ধির জন্য বিবেককে জাগ্রত রাখাই যে সর্বাংশে মঙ্গলকর—সেই দার্শনিক মীমাংসায়ও আমরা এ-উপন্যাস থেকে উপনীত হতে পারি।

দুই

যে মানুষেরা পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও মোহনীয় করে গেছেন, সেই প্রয়াত মহৎ ব্যক্তিদের কয়েকজনের বিদেহী আত্মার সমাগম ঘটানো হয়েছে 'সমাগম' উপন্যাসে। উপন্যাসটির বাহ্যিক আখ্যানে আছে: কবি আলাওল উপযাচক হয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণের এক চিঠি দেন ঢাকার এক পত্রিকার সাব এডিটর জনৈক জুহার কাছে। জুহা সেই মোতাবেক নিজের ও বন্ধুদের উৎসাহে আরও কয়েকজন স্মরণীয় ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হাজী মুহম্মদ মোহসীন, বেগম রোকেয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমাঁ রলাঁ ও বার্নার্ড শ। সাহিত্যবিশারদ ও বেগম রোকেয়া ছাড়া অন্যরা উপস্থিত হন এবং তাঁদের বিজ্ঞ কথোপকথন ও বিতর্কে একটি রাত অত্যন্ত উপভোগ্য ও মোহনীয় হয়ে ওঠে। রাতের শেষ পর্বে অনাহূত অবস্থায় এসে উপস্থিত হন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লিও তলস্তয়।

এরকম একখানি অবান্তর ও উদ্ভট ধরনের আখ্যান রচনার উদ্দেশ্য যে অত্যন্ত মহৎ ও সুবিবেচনাসম্মত, রাত্রিশেষে বিদায় লগ্নের পানাহারের শেষে উচ্চারিত তাঁদের আন্তরিক কামনায়-ই তা সুস্পষ্ট:

"মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক।"

"ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।"...

"মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসাবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।"...

"সুখীতর, আরো সমৃদ্ধতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।"[১৪]

সমগ্র উপন্যাসে বিভিন্ন বক্তার সংলাপে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে চরমতম ঘৃণা ও ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চারিত হয়েছে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবাদের জয়গান। নিমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকা প্রস্তুতকরণেই প্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের প্রমাণ মেলে। একটি বিতর্কেও কোনো এক বক্তার বক্তব্য থেকে এই বোধের সপক্ষে উচ্চারিত হয়েছে এক মহৎ সংলাপ:

> এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত। আমরা জানি ইংরেজ-ফরাসী-ডাচ এবং য়ুরোপের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরা একটা কুকুরের বেশী মর্যাদা দাবী করতে পারে না। কিন্তু তা নিয়ে ঝামেলা পাকানো উচিত নয়। এখন প্রয়োজন, কিভাবে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে--- তা-ই দেখা।[১৫]

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সেই হিসেবে উপন্যাসটিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনাবাহী উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করাই সঙ্গত। উপন্যাসে গৃহকর্তা জুহা তার চাকর আলী-র নাম নিয়ে যে-রসিকতা করে, তাতেও সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী ক্ষোভ স্পষ্ট :

> বাবা, ইংরেজী-বাংলা জবানে এমন মাখামাখি আছে বলেইত কমনওয়েলথী গাঁটছড়া এ্যায়সা মজবুত।[১৬]

উপন্যাসের অন্তর্গত আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে কবি আলাওলের আত্ম-কাহিনীর মাধ্যমে। ইউরোপ থেকে আগত হার্মাদদের দ্বারা একদা

বঙ্গোপসাগরে আলাওলের পিতার বজরা লুট ও তাঁর পিতাকে হত্যার ঘটনা আছে এই আত্মকাহিনীতে। সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের পূর্বপুরুষ এই হার্মাদদের বিরুদ্ধে আলাওল-উচ্চারিত ক্ষোভ মূলত চিরকালীন সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী উক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে:

> ...সেদিনের দু-একটি প্রাণ-নিধনের কাছে আজকের হত্যাযজ্ঞ শিশুক্রীড়া মাত্র। আজকের হার্মাদেরা আরো জোরদার। সেদিন বন্দুকের মোকাবিলা করতে পারেননি বলে আফশোষ ছিল আপনার। তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হাতিয়ারের মালিক আজ তারা। এক লহমায় শহরের দু'চার লাখ মানুষ ধ্বংস করতে পারে---এমনি তাদের অস্ত্র-বল। আপনি নিজের বসত ঘর হারিয়েছেন। আজ হার্মাদের জুলুমে কোটি কোটি মানুষ গৃহহীন।[১৭]

উপন্যাসে মাইকেল মধুসূদন যখন নিজেকে বার্নার্ড শ'-এর স্বদেশবাসী অর্থাৎ আইরিস হিসেবে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন তখন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণাই পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়:

> Ireland was the first colony of the British Imperialist. They had begun by Plundering their own neighbour long before my motherland. As such we know each other like our palm.[১৮]

আমন্ত্রিত অতিথিদের পানাহারের প্রথম টোস্টেও সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস কামনা উচ্চারিত হয় বার্নার্ড শ'-এর দরাজ কণ্ঠ থেকে:

> To the dying soul of the world Imperialism.

ওদের মুমূর্ষু আত্মার উদ্দেশে এই আনন্দ প্রস্তাবনা যে ওদের মৃত্যু-কামনারই নামান্তর, শ' তা পরে ব্যাখ্যা করেন:

> মাছ ডাঙায় তোলায় বেশী আনন্দ নেই। আনন্দ হচ্ছে গেঁথে খেলানোর মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আমি এই Gold-digger swine-দের মৃত্যু কামনা করেছি। কিন্তু তখন ওরা মরেনি। আজ ওরা মরছে। তাই একটু লবণ ছিটিয়ে নিলাম।[১৯]

সভ্যতার নামে যে কত বর্বর ও জঘন্যতম কর্মসাধন করেছে সাম্রাজ্য বাদীরা, কথোপকথনসূত্রে তারও কিছু পরিচয় বিধৃত হয়েছে এ-উপন্যাসে। ইতিহাস থেকে প্রকৃত সত্যকে তুলে আনা হয়েছে এ-সব বক্তব্যে :

> ...১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ আর ফরাসী দুই বরাহ মিলে চীনের "গ্রীষ্মপ্রাসাদ" ধ্বংস করল।...তারা ধ্বংস করল সুং আর মিঙ আমলের যত অমূল্য ছবি, মূর্তি, কারুকার্য-খচিত চীনামাটির বাসন, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি---এই শিল্পকলার জন্য চীন হাজার হাজার বছর খ্যাত ছিল। ...হিটলারের পাপের চেয়ে এদের পাপ বিন্দুমাত্র কম নয়। মানুষের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি এই ইংরেজ আর ফরাসীরা ধ্বংস করেছিল দেশ জয়ের নামে, সভ্যতা গর্বের অভিমানে।[২১]

এই উপন্যাসে উচ্চারিত হয়েছে প্রকৃত মানবতার বাণী। এই মানবতা একমাত্র শ্রেণীশোষণের অবসানের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্যথায় নয়। শোষণকে বজায় রেখে যারা মানবতার কথা বলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক তাতে অভীষ্ট লক্ষ্য যে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হওয়া দুঃসাধ্য, দাতা হাজী মুহম্মদ মোহসীনের জীবন-সাধনার ব্যর্থতার উদাহরণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে সে-সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

> ...আসলে আপনারা দারিদ্র্য পুষে রাখতে চান। আর তার জোরে দানবীর, দাতা ইত্যাদি নাম কেনার পক্ষপাতী। আপনারা আসলে মানবপ্রেমিক নন।...
>
> ...আপনি দুঃখ-দারিদ্র্য যেমন দেখে গেছেন, জনাব মহসীন, তার চেয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ আপনাদের গোড়াটাই ছিল ভুল। দস্যুরাই এখনও দানবীর। প্রবৃত্তিকে বাদ দিয়ে যে ভুল করেছিলেন, এখনও সেই ভুল থেকে গেছে। তার জের চলছে।[২২]...

প্রকৃত মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সপক্ষে বক্তব্য উচ্চারণও সঠিক নয়। কেননা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদও এমন এক ধরনের বিকৃত ব্যক্তিস্বার্থসর্বস্ব শোষণমূলক মতবাদ, যার শেষ

পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে। আলোচ্য উপন্যাসে এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের মুখোস উন্মোচন করা হয়েছে :

> ...জাতীয়তাবাদের জন্ম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা থেকে। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি সাম্রাজ্যবাদ। তার পরিণতি যুদ্ধ।...
>
> ...প্রথম মহাযুদ্ধ যখন লাগল, ইংরেজ জনসাধারণ ভাবলে, তার দেশের নেতারা ইংল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে। কিন্তু তারা যে নিজেদের শোষণের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তা আর দেশ-বাসীকে বুঝতে দেয়নি। জার্মান আর ইংরেজ দস্যুর স্বার্থের লড়াই বেধেছিল তা আর বুঝতে দেয়নি। মানবতা, স্বাধীনতার বুলির আড়ালে ছিল তাদের জঘন্য লালাসিক্ত লোভের লেলিহান জিহ্বা।[২৩]

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার সূত্র ধরে এ-উপন্যাসে তাই ধ্বংস, মিথ্যাচার ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে ব্যক্ত হয়েছে সুগভীর আন্তরিক কামনা :

মধু॥ ...দেশ যখন যুদ্ধ-রত
তখন ঝুটের সংখ্যা
দেশে বালু আছে যত।

বিদ্যা॥ ...যা সত্যের বিরোধী, আমি তার বিরোধী তাই যুদ্ধের বিরোধী। সব অশান্তির গোড়া এই যুদ্ধ।

মহসীন॥ আমি ভেতরে বাইরে শান্তি খুঁজেছিলাম। বাইরের অশান্তি দেখে শেষে ভেতরে তার সন্ধান করতে লাগলাম। কোনরকম জোরাতালি। শেষ পথ ধরলাম : মানব-সেবার।

শ' ॥ কিন্তু আজ আর তা সম্ভব নয়। বাইরের শান্তি ব্যতিরেকে ভেতরে শান্তি অসম্ভব।[২৪]

সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায়, বিশ্বের মহৎ ব্যক্তিদের কণ্ঠ থেকে এ-উপন্যাসে, রূপকাধারে উচ্চারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে,

শোষণের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, চরম ঘৃণা ও ক্ষোভ ; আর এর বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, শোষণহীন মানবতা ও বিশ্বশান্তির প্রতি এক উদগ্র কামনা—যা সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণই লেখকের অন্বিষ্ট।

তিন

"রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসের মধ্যে যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে, তা'হলো : জালেম রাজা জাহুক দৈববাণী কর্তৃক এই মর্মে অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে দুইটি কলো বিষাক্ত গোক্ষুর তার গলা বেষ্টন করে থাকবে। বিশ থেকে পঁচিশ জন যুবক-যুবতী কিংবা ইলমদার বৃদ্ধের মগজ হবে দুই সাপের নিত্যদিনের আহার। এই আহার যোগাতে ব্যর্থ হলে সাপদ্বয় জাহুকের মগজই ভক্ষণ করবে। রাজাকে বাঁচানোর জন্য সারা রাজ্য চষে যুবক-যুবতী এবং পরে ইলমদার বৃদ্ধদের ধরে আনছে রাজার সিপাহী-সান্ত্রীরা। এভাবে যাদের জীবন উৎসর্গিত হচ্ছে তারা জানেনা তাদের অপরাধ কী। এদিকে রাজদুহিতা মাতৃহীন কুমারী গুলশানের নিঃসঙ্গ জীবন দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠছে। তার পিতার জীবন-রক্ষার জন্য যাদের জীবন বলি হচ্ছে তাদের প্রতি মানবিক মমত্ববোধ থেকে সে বন্দীশালায় গিয়ে হরমুজ নামে এক সুদর্শন যুবকের রূপে মুগ্ধ হয়। হরমুজকে সে মুক্তি দেয় কিন্তু হরমুজ একার মুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং শাপগ্রস্ত রাজার কাহিনী শুনে সে অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজার শাপমুক্তির প্রচেষ্টা চালায়। তার প্রচেষ্টা সফল হয়। রাজা শাপমুক্ত হয়ে নতুন জীবনোপলব্ধিতে পৌঁছেন :

> ...আমি জাহুক বাদ্‌শা নই। আমি নতুন রাজ্য গড়ব, যেখানে মানুষের জন্য কোন মানুষকে জুলুম ভোগ করতে হবে না। যে সকলের গোলাম হোতে পারবে সেই হবে সকলের বাদ্‌শা।...[২৫]

ছোটবেলায় একটি গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীর কয়েকটি মূল্যবান উক্তিই হরমুজের চেতনাকে এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেছিল। এই চেতনাই

তার দ্বারা রাজার শাপমুক্তির মতো অসাধ্যসাধন সম্ভব করে তোলে। গেরুয়া বসনধারী বলেছিলেন :

> লোভ করো না। যখন লোভ করবে, তা গোটা রাজ্যের সকলের জন্য করবে। তা হোলে লোভ আর লোভ থাকবে না। কিন্তু একার লোভ থেকে জন্মায় ঈর্ষা, হিংসা। আর তা থেকে আসে ধ্বংস।[২৬]

সামূহিক স্বার্থের চেতনাই এ-উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। হরমুজের মতো অশিক্ষিত গ্রাম্য যুবক এই চেতনাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই রাজাকে যেমন শাপমুক্ত করতে তেমনি রাজ্যের বহু অমূল্য প্রাণকে বাঁচাতেও সক্ষম হয়েছিল—সক্ষম হয়েছিল 'রাজকন্যা গুলশানকে বিয়ে করে রাজত্বলাভের লোভ দূর করতে। গুলশানের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই কারাগারে বন্দিনী রুদকে বিস্মৃত না হওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়েই সে রাজ্য-লোভ ও রাজকন্যালোভ ত্যাগ করে। সাধারণ গ্রাম্য যুবক হয়েও প্রতি-শ্রুতি রক্ষার এক মহান আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছে হরমুজ। অথচ রাজা প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতে জানে না--এমনই একটি ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসের শুরুতে কবি ফেরদৌসীর বক্তব্য থেকে :

> ...দরবার জৌলুষের দাম জানে, প্রতিশ্রুতির মূল্য বোঝে না। ধ্বংস হোক মিথ্যার এই পাদপীঠ, প্রাচীর সীমানা ডিঙ্গিয়ে যার স্পর্শ শীতের সূর্য্যের মত তুষ গ্রামে পেঁাছায় না, মুছিয়ে নিতে এগোয় না মানুষের চোখের পানি---যা বন্যার পানির সহোদরা। ধ্বংস হোক গো-মতি পশ্বাচারী দরবারী অরণ্য।[২৭]

শাসকের বিরুদ্ধে হরমুজের মতো বন্দীরা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে---কেননা তারা জানেনা কী অপরাধে তাদের এই বন্দীদশা। শাসকের সঙ্গে তারা এমন কোনো বিবাদে লিপ্ত হয়নি----যার অপরাধে তাদের এই বন্দীত্বের শাস্তি হতে পারে। তবে তাদের সাধারণ উপলব্ধি যে রাজার সঙ্গে প্রজা কোনো অপরাধ করলে সেজন্য রাজা কর্তৃক প্রজার শাস্তি অনিবার্য। কিন্তু উৎপীড়ক শাসক তাদের বিনাপরাধে বন্দী করে যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি কি প্রজা কর্তৃক রাজা পাবে কিংবা অন্য কারো দ্বারা? ---এ এক গণতান্ত্রিক প্রশ্ন হরমুজের মনে :

> বাদশা যদি মানুষ হয়, তার ভুল চুক নিশ্চয় ঘটে। তখন তার কোন শাস্তি হয় কি? কে দেয়? বাদশা ত মানুষ, তা নিয়ে কোনো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। খামখা কল্পনা করে লাভ কি? সবাই জানে, বাদশা মানুষ। বাদশার অসুখ করে। তবে সে মানুষের ধর্ম মানে না কেন? হুকুম দিতে তার ত ভাবা উচিত। তার ভুল চুক আছে। সুতরাং কারো প্রাণ নিয়ে টানাটানি করা উচিত নয়।[২৮]

মানুষ ও জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ রাজদুহিতার বাঁদী সেহেলীর মনেও সমরূপ। কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রোগমুক্তির জন্য যখন মনুষ্য বলিদানের প্রশ্ন ওঠে, তখন রাজদুহিতার কাছে বিষয়টি অত্যন্ত সাধারণ হলেও সেহেলী জীবন সম্পর্কে তুলে ধরে গভীর মমত্ববোধ। নিজের জীবনের মায়া তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয় না। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়েও একজন সাধারণ বাঁদী সঙ্কীর্ণতা-ঊর্ধ্ব এক উদার মনোভঙ্গীর পরিচয় দেয়। সামগ্রিকভাবে জীবনের প্রতি এক গভীর ভালবাসাবোধ থেকেই তার নিম্নোক্ত উচ্চারণ:

> একজন বিসর্জন দিয়ে যদি আর একজন রক্ষা পায়, এমন ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার সার্থকতা কোথায়? যেখানে একটি প্রাণের বিনিময়ে শত প্রাণ বাঁচে, তেমন ক্ষেত্রে হয়ত ভেবে দেখার সুযোগ ছিল। কিন্তু যেখানে লাভ-লোকসানের পাল্লা সমান, সেখানে একদম চুপ থাকাই কি মঙ্গল নয়?[২৯]

পারস্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জামসেদ দারিয়ুস ও তাঁর বন্ধু জার্জিস রাজা জাহকের গণ্ডবেষ্টিত সর্পের আহার যোগানোর জন্য যুবক ও বৃদ্ধদের সরবরাহ করার কাজ নিয়ে প্রচুর অর্থ আয় করেছিল। কিন্তু অবশেষে দু'জনেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সর্পের আহারে পরিণত হয়। দারিয়ুস যে উপলব্ধি নিয়ে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে, তা হলো: যে-কাজ করে তারা অর্থ আয় করছে তাতে তো রাজ্য থেকে মনুষ্যত্বের বিলোপ ঘটছে তাদের অর্জিত অর্থ যে বংশধরদের জন্য তারা রেখে যাবে তাদের তো বাস করতে হবে পশুর রাজ্যে---তাতে লাভ কি? জার্জিস বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে জীবন উৎসর্গ করে। দু'জনের

সিদ্ধান্তই মহৎ আদর্শের ইঙ্গিতবহ। এ-সংক্রান্ত দারিয়ুসের উক্তি প্রণিধান-যোগ্য:

> এই মগজ সরবরাহ দু'জনেই করেছি। কিন্তু চিন্তা করা অভ্যাস ছিল। একদিন বুঝতে পারলাম, দশ বছর ধরে এত নওজোয়ান কি জ্ঞান-সরস বৃদ্ধের যোগান দিলাম। দেশের মগজ থাকবে না। তখন থাকবে কি? থাকবে শুধু পশুত্ব। ওদের যতটুকু মগজ আছে, ততটুকু থাকবে দেশে। অর্থাৎ দেশ জানোয়ারের দেশে পরিণত হবে। ...কিন্তু জানোয়ারের দেশে সব সম্পদ দিয়ে তুমি তোমার বংশধরদের রেখে যাচ্ছ। তারা কী দিয়ে সুখী হবে? জঙ্গলে জানোয়ার সুখী, আর কেউ না।[৩০]

সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থ নয়, বরং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সংকীর্ণ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ারই এক মহৎ আদর্শ এ-উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। লোভ--ব্যক্তিস্বার্থে নয়, সমষ্টির স্বার্থে পরিচালিত হলে তা মঙ্গলই বয়ে আনে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র--সর্বত্রই এই চেতনা অনুসরিত হলে তা সঠিক কল্যাণই সূচিত করে। শোষণমূলক সমাজে সমষ্টির স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থ বড়---তাই সেখানে লোভের আগুনও মারাত্মক। রেষারেষি, দলাদলি, হানাহানি, নিপীড়ন, অত্যাচার ও যুদ্ধের হোলিখেলায়, নরমেধযজ্ঞে ঐ সমাজ অত্যন্ত কলুষিত। শোষণমূলক ঐ সমাজের প্রতিই রূপকাধারে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে 'রাজা উপাখ্যান' উপন্যাসে।

চার

'পতঙ্গ পিঞ্জর'-এর কাহিনীটি নিম্নরূপ: গৌড়গ্রাম নামে বাংলাদেশের একটি অজ পাড়াগাঁ-র অশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ চরম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার শিকার হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি। প্রথমে তপ্ত দাবদাহে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গ্রামবাসীর, যার বিরুদ্ধে তারা সক্রিয়তার কোনো পথ খুঁজে পায় না। মসজিদের ইমামের পরামর্শে গণমোনাজাত করার পর দাবদাহের অবসান ঘটে। আকাশে দেখা দেয় মেঘ, মেঘের

পুরু আস্তরণ—কিন্তু সে মেঘে বৃষ্টি হয় না। এরকম এক সুশীতল পরিস্থিতিতেই ঘটে পতঙ্গের আক্রমণ। পতঙ্গের আক্রমণে শস্য-ফসল উজাড় হয়, দেখা দেয় তীব্র খাদ্যসঙ্কট। মানুষ মারা যায়, দলে দলে গ্রাম ছাড়ে। মসজিদের ইমাম ও শহর থেকে আগত মোহাম্মদ আলী নামের এক কবি এই মর্মে ফতোয়া দেন যে পতঙ্গের আক্রমণ দৈবের অভিশাপ, এর বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করণীয় নেই; পতঙ্গ মারলে আরও কোনো কঠিন বিপদ নেমে আসতে পারে গ্রামবাসীর ওপর। তাই কঠিন ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই দৈব-অভিশাপের ব্যাপারে। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষেরা একথা বিশ্বাস করে সহজে—যদিও তরুণদের কেউ কেউ অবিশ্বাস করে প্রথম থেকেই। অবিশ্বাসী তরুণেরা গোপনে পতঙ্গ মারতে থাকে। কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে ধৈর্য ধারণ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। অবিশ্বাসী তরুণের দল ক্রমেই ভারী হয়। গ্রামের মাতব্বরের নেতৃত্বে তারা জোটবদ্ধ হয়ে উপায় উদ্ভাবন করে। সুড়ঙ্গ কেটে ভিন্ন গায়ে গিয়ে পতঙ্গের রহস্য উদ্‌ঘাটনের সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করা হয়। এবং ভিন্ন গায়ে গিয়ে তারা জানতে পারে এ-সব দৈব অভিশাপ নয়, এগুলো মারলেই সহজে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব। সে-অনুযায়ী, গ্রামবাসীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তারা। এই উদ্ধারপর্বে ফতোয়া প্রদানকারী কবি সংগ্রামী তরুণদের দ্বারা আক্রমণের শিকার হন :

> গফুরের ব্যঙ্গস্বর—হালারে কইয়া দে, সুড়ঙ্গ কাইট্যা মানুষের কাছে খবর লইছি, ওগুলো পোক্ পোক্-লোক না। মারলে গুনা (পাপ) অয় না। তারপরই সে সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়েছিল,—সুড়ঙ্গে ঢোকা ব্যাডারে। (কবিকে) ভয় পাইয়েন না কবি সা'ব। হাঁইট্যা চইলা যান, পোকে খাইব না।
>
> ...মাদবর সাহেব, আমি যাচ্ছি। একটা অনুরোধ---।
> ...আমার কবিতার খাতাগুলো এনে দিতে বলেন।
> ---যেহানে আছে সেহানেই থাকতে দিন। চাঁচাঁছোলা কণ্ঠ গফুরের।
>
> কিন্তু খেদোক্তি কবির গলায়,---না, না, ওখানে থাকলে পোকায় খেয়ে ফেলবে।

---মানুষকে পোকায় খাচ্ছিল, তাতে তোমার---হালা আপ্‌নের---কিছু তক্‌লীফ অয় নাই। অহন ক'ডা কবিতার জন্য শোক---মার হালা।

গফুর সত্যি কবির পাছায় এক লাথি মেরে বসেছিল এবং বড় বাড়াবাড়ি মনে হওয়ার ফলে মাদবর অসোয়াস্তি ভোগ করে। কিন্তু গফুর তখন পঞ্চমে,---কবি সা'ব, ওই কবিতা লেখার চাইয়া লোম ছিঁড়বেন অনেক কামে লাগবে।[৩১]

পরশ্রমজীবী জনবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীকুলের এক চমৎকার উদাহরণ কবি মোহাম্মদ আলী। এদের নিষ্ক্রিয় জীবনধারা কখনও কোন বিপদ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। তা ছাড়া জনবিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের মনের গভীরে যে সীমাহীন ভয়, তার ফলেও সংকটকে দৈব-নির্দেশিত বলে মেনে নিয়ে তারা নিষ্ক্রিয় থাকে। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সচেষ্ট না হয়ে তারা সক্রিয়তার ফলে সংকট যদি তীব্র হয় এই ভয়ে আরও নিষ্ক্রিয়তার পথেই ধাবিত হয়। মোহাম্মদ আলীর ওপর গফুর ও তার সহকর্মীদের আক্রমণের ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ শেষে রাজাকারদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গৌড়গ্রাম এখানে বাংলাদেশেরই রূপক যেন এবং পতঙ্গকুল হানাদার পাক বাহিনীর। ইসলাম নামধারীদের দূরভিসন্ধিমূলক ফতোয়ার বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় প্রতিরোধ দেশকে বিপদমুক্ত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে যেমন হানাদারদের হামলায় উজার হয়েছিল শস্য শ্যামল মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মানুষ মরেছিল নির্বিচারে এবং দেশ ছেড়েছিল দলে দলে---সবকিছুই যেন রূপকাধারে বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনীতে।

স্বদেশভূমি ছেড়েছিল যারা অতিকষ্টে, বাধ্য হয়ে, এবং মরেছিল ভিন্নদেশে, তাদেরই এক করুণ আর্তি ফুটে উঠেছে এক বালকের মুখ থেকে :

বালক বিস্ফারিত, উদাস-নয়ন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেছিল,---বাবা, গাঁয়ে কি কবর দেওয়ার জায়গা ছিল না? তুমি কি আমাদের এখানে কবর দিতে আনছিলে?[৩২]

পরশ্রমজীবীদের প্রতিভূ কবি মোহাম্মদ আলী-র ফতোয়া যে যুবকদের স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মীয় মৌলপন্থীদের ফতোয়ার সমরূপ তা কবি ও মাতবরের নিম্নোক্ত কথোপকথন থেকে আরও স্পষ্ট :

---কিন্তু কবি-মহাশয়, পোলাবান ধুঁকে মইরব। হে কী বাপ বইস্যা দেখতে পারে?

"—সমস্যার চোখে আপনি আঙুল দিয়াছেন"...

"—কিন্তু মানুষ কী শত শত বছর সবুর করতে পারে?"

—পারা উচিত।

---হুজুর...গত দু মাসে আমাগো গাঁয় কম-সে-কম দুশ পোলাপান মরছে। বয়স এক মাস থেইক্যা সাত-আট বছর।

---কেন?

—দুধ পায় নাই, খাইতা পায় নাই।

---শুধু তা না। আল্লাও ওদের দুনিয়ায় রাখতে চায়নি।

—দুধের বাচ্চা দুধের অভাবে মরছে। আপনি কন আল্লার মর্জি?...

—আপনি বুড়া মানুষ বুঝবেন না। পবিত্র পতঙ্গ। ছোকরারা চোরাগোপ্তা মারছে।

আল্লার হয়ত তা---ইচ্ছা নয়। গজব (অভিসম্পাত) কি মাঠে আসে?

—কিন্তু কবি মহাশয়... বাপ-মার ভিটা ছাড়া কতো মানুষে চইলা গেল।

...---আপনি ওদের বোঝান নি?

—কত কইছি, হুনে কই।

---কেন শোনে না?

---হুজুর, আমি তাগোর পেট ক্যামনে সামাল দিমু?

—এই দেখেন—পেট আবার পেটের কথা। অথচ মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আপনি পেটের কথা তুলছেন।

—হুজুর, পেটও আল্লায় দিছেন। আমার কইতে দোষ...?[৩৩]

এই উপন্যাসের কাহিনী আমাদের চেতনাজগতে এ-সত্যই উদ্ভাসিত করে যে সংকট যতই পর্বতপ্রমাণ হোক না কেন সক্রিয়ভাবে প্রতি-রোধের মানসিকতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলে সংকট থেকে উত্তরণ

কঠিন নয়। এটা এক শাশ্বত সর্বজনীন সত্য---মুক্তিযুদ্ধ যার নিকটতম বড় প্রমাণ। বৃদ্ধ মাতব্বরের নেতৃত্বে গ্রামের ক্ষুধাক্লিষ্ট যুবকরা ঐক্য-বদ্ধ হয়ে ভিনগাঁয়ে যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গ কাটার এক অসাধ্য কর্ম সম্পাদন করে। রাতের অন্ধকারে সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করে এ-ধরনের একটি কঠিন কর্ম সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় একমাত্র ঐক্যের শক্তি এবং দৃঢ় মনোবলের জন্যেই :

> প্রথমে যা মনে হয়েছিল নির্বোধের অভিধানে প্রাপ্ত শব্দ--- অবিশ্বাস্য অসম্ভব—তা-ই ঘটতে লাগল ধীরে ধীরে অস্পষ্ট এবং পরে দ্রুত স্পষ্ট যে তার সামাল দিতে বহুত কাঠ-খড় দরকার।... যখন সুড়ঙ্গ অনেকখানি প্রসারিত তখন বহু লোকের সাহায্যের নিঃশ্বাস এসে লেগেছিল ছোটখাট নানা কাজে। ...নৈশ অন্ধকারে সর্বপ্রকার গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক অতখানি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তা-ও স্বাভাবিক আহার, শরীর বা বিশ্রামে নয়--- কখনও পেটের ক্ষুধা পেটেই হত্যা করে অথবা মাথা রিমি-ঝিমি-রত তবু কোদাল চালিয়ে যাওয়া ঠিক স্বপ্নার্পিতের মতো-কত কঠিন তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পর্যন্ত বহুদিন গিয়েছিল ঠাওর করতে। অনেকের বিশ্বাস হতে চায়নি তারা অসুরের কাজ সম্পন্ন করেছে পলকা শরীরে, কাঠবিড়ালীর মতো যদিও উৎসাহ অস্থিরতার অভাব ছিল না। ...এক ভূতে পাওয়া ব্যাপার ছাড়া অন্যভাবে এর ব্যাখ্যাদান অচল। কিন্তু ভূত একজনকে নয়, বহুজনকে এমন পেয়ে বসেছিল যে পরদিন সকালে যারা রাত্রে প্রচণ্ড খাটুনি খেটেছিল তাদের দ্যাখো যেন কিছুই হয়নি। নিদ্রা-হীনতাজাত ছাপ থাকে, পিচুটি পড়ে, তাও এতটুকু বের করা দুঃসাধ্য। তখন মনে হবে সকলেই যেন অমৃত বারি বা ফল-খাদক---ফলে, তাদের পার্থিক কোন আহারে প্রয়োজন নেই এবং তাদের সর্ব-আসুরিক শক্তির উৎস সেই রস।[৩৪]

এ-উপন্যাসে পরশ্রমজীবীদের জনবিচ্ছিন্ন মস্তিষ্ক-চিন্তার বিপরীতে বাস্তব জীবনের পোড়-খাওয়া শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় উদ্যোগের কল্যাণ-কর ফল আমরা প্রত্যক্ষ করি। জনবিচ্ছিন্ন মস্তিষ্কের চিন্তা সর্বদা বাস্তবতাবিবর্জিত। তাই জনজীবন-সংলগ্নতাই সঠিক সিদ্ধান্তের জন্ম

দিতে এবং ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে সক্ষম। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারীরাই যদি হয় তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যদি হয় অনারোপিত, তাহলে সফলতার সম্ভাবনা শতভাগ---উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই।

আলোচ্য চারটি উপন্যাসের তিনটিতেই বিভিন্ন রূপকের আশ্রয়ে নিপীড়ক শাসকের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এবং একটিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণা ব্যক্ত হয়েছে।

দুইটি উপন্যাসের ঘটনাংশ নির্বাচন করা হয়েছে ইতিহাসে বিস্মৃত-প্রায় মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামী শাসনকাল থেকে। ঘটনাংশ নির্বাচনেও লেখকের রূপকধর্মী মানসিকতা কার্যকর। স্মর্তব্য যে পাকিস্তানী শাসকেরা ইসলামের নামেই সকল নিপীড়নমূলক তৎপরতা পরিচালনা করেছে। প্রতিটি রূপক সৃষ্টির পেছনে যে-মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে, তা হলো: মানবকল্যাণ। প্রকৃত মানবিক প্রেমে উৎসারিত শওকত ওসমানের স্রষ্টামানস সর্বপ্রকার শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের অবসান কামনা করেন, চান প্রকৃত শান্তি, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। তাঁর এই উদ্দেশ্য উপন্যাসে স্পষ্টভাবে সরাসরি ব্যক্ত হয়নি। কেননা তাতে শিল্পের আবেদনই যে ক্ষুণ্ন হয়---কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। শুধু শিল্পের খাতিরেই নয়, হয়ত দেশে বিদ্যমান অস্থিতিশীল গণতন্ত্রহীণ রাজনৈতিক পরিবেশও তাঁকে রূপকাশ্রয়ী[৩৫] হতে বাধ্য করেছে।

আলোচ্য চারটি উপন্যাসেই বিষয় ও আঙ্গিকের সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছে। প্রতিটি উপন্যাসই ভাষা ব্যবহারের ওজস্বিতায় কিংবা সৃষ্টি-ক্ষমতার সফলতায় চূড়াস্পর্শ[৩৬] করেছে। 'সমাগম' ও 'পতঙ্গ পিঞ্জরে' এই সফলতা সর্বাধিক। 'পতঙ্গ পিঞ্জর'-এ ব্যবহৃত হয়েছে এক সার্থক চৈতন্যপ্রবাহরীতি। এই দুইটি উপন্যাসে ওজস্বী, গতিশীল অথচ বিদ্রুপাত্মক ও কৌতুকপূর্ণ ভাষাব্যবহারের উদাহরণ নিম্নরূপ:

ক. মি: শ' আপনি ত ভেবে দেখেননি। আপনি ভাঁড় না হোলে কি ওরা আপনাকে সহ্য করত? আপনি বিংশ শতাব্দীর গোড়া জুড়ে কত মারাত্মক মারাত্মক কথা বলছেন। ওরা আপনার

কানও ধরেনি! আর সেই সময় আমার দেশের মানুষ সাধারণ কথা বলেছে। আপনার মত চটকদার নয়। 'মানুষের মত আমাদের অধিকার দাও, আমাদের স্বাধীনতা দাও'। এই সামান্য অপরাধে তাদের গলা টিপে ধরেছে ইউরোপের সেই ব্যক্তিরা, যারা আপনার আরো বেশী মারাত্মক কথা সহ্য করেছে। তারাই এদেশের তরুণদের ঝুলিয়েছে ফাঁসি-কাঠে, বুটে চুরমার করেছে নর-নারীর স্বপ্ন-ঘর, পাজঁর। আপনাকে তারা সহ্য করেছে Because you are a court-jester, a superclown---a residual product of your Superman—।...মিঃ শ' যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। সমস্ত ইউরোপীয়রা ভাবে Europe is the world, আপনি তার বাইরে যেতে পারেননি। আপনি ওদের গোত্রীয়---তাই আপনাকে তারা এখন St. Bernard বানিয়ে দিয়েছে, অবশ্যি ঐ নামে এক জাতের কুকুর আছে। The arch-Bishop of England is your blood-brother now and was so you did not realize. আর এই মুরোদ নিয়ে আপনি সেক্সপীয়রের সঙ্গে টেক্কা দিতে যান। As if dark lady of the sonnet is your mother. সেক্সপীয়র আর্টিস্ট এবং আপনি হচ্ছেন স্রেফ একটা ভাঁড়, clown---।[৩৭]

খ. গফুর যে নিজেই লয়—প্রাপ্ত এতক্ষণ অধৈর্যের গঙ্গায় মজ্জমান ছিল, ভেসে উঠলো আলতো সমীরের সঙ্গ-সুধায় এবং হাত নয়, দুটো আঙ্গুল শুধু বাড়িয়ে দিতে লাগল যতক্ষণ না তা স্পর্শ করে একটা স্তনের চুচুক---গোল এবং নরম, অতি নরম, সন্তানের সর্ব দৌরাত্ম্যবঞ্চিত। সাপের গায়েও হাত পড়লে হয়তো এত দ্রুত আঙুল পেছিয়ে নিতে পারত না গফুর যেভাবে তা পশ্চাদাপসরণ ঘটল। ...ধরা পড়েছিল, বক্ষ নয় কটিদেশ যেখানে গফুরের মুখ ঠেকে গিয়েছিল এবং তার পটল (বেটেঁ-খাটো নাদুসনুদুস সখিনার স্বামীপ্রদত্ত নাম) যেন নিমেষে শালবৃক্ষের উচ্চতায় অধিষ্ঠিত, তারই কচি শাখার মতো দোদুল, যেমন শিকেয় হাঁড়ি দোলে, দুলছিল, হিন্দোল-হিন্দোল রাগ হোলির উৎসবে। অস্বাভাবিকতার ধাক্কা গফুর সামলে উঠেছিল

কি ওঠেনি এমন বাছবিচারের অবান্তরতার ফাঁক দিয়ে দেখা গিয়েছিল, সে পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীদের পিদিম (যার সামনে বসে একজন তামাক খাচ্ছিল, এবং সহসা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য চিৎকার পেড়েছিল, কে-কে?) এনে দেখেছিল গফুর—না দেখেনি, না দেখেছিল: তার সখিনা আপন মহিমার রঙে কতো ঊর্ধ্বে উঠে গেছে এবং ঝুলছে সেই ভেজা বস্ত্রের সাহায্যে কড়ি-বাঁশ-সংলগ্ন। যে-বস্ত্র তার লজ্জা নিবারণ করত, সেদিন তা রমণীর তাবৎ লজ্জা কেড়ে নিয়েছিল অথবা ঢেকে দিয়েছিল ঠাণ্ডা নৈঃশব্দ্যে, হিম-তুষার শৈত্যে।[৩৮]

দুটি বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিসূত্র হলেও এ-থেকে, লেখকের সামগ্রিক শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা সম্ভব। আসলে শওকত ওসমানের সমাজ-সচেতনতা, জনজীবনসম্পৃক্ততা, মানবহিতৈষণা প্রভৃতি অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে রূপক উপন্যাসগুলিতেই ইতিবাচক অর্থে তীব্রতা লাভ করেছে। আর এরই সার্থক অনুসারী হয়েছে তাঁর শিল্পবোধ ও শিল্পসুষমা তথা শৈল্পিক শক্তি। সার্থক ও সুসমন্বিতভাবে তিনি আঙ্গিককে বিষয়ের অনুগামী করে এই শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ রূপক (allegory) বলতে এমন এক ধরনের নীতিমূলক আখ্যানকে বোঝায়, যার অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বিবিধ : উপাখ্যান ও উপাখ্যান-অতীত ভাবের অর্থ। রূপকের অভ্যন্তরস্থ আখ্যান দুটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন। কোনো গভীর অন্তর্সত্যকে অস্পষ্টতার আচ্ছাদন দেওয়ার জন্যই দুইটি আখ্যানের আশ্রয় নিতে হয়। রূপকের সঙ্গে প্রতীক কিংবা সঙ্কেত-আশ্রিত সাহিত্যের সম্পর্ক নিবিড়। সমালোচকদের মধ্যে এ-নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রকরণগত নিবিড়তার কারণেই সমালোচকেরা দুটি বিষয় নিয়ে সবসময় তুলনামূলক আলোচনা করেন।

C. S. Lewis বলেন: Symbolism is a mode of thought, but allegory is a mode of expression. (The Allegory of

love, Oxford University, London, 1979, First Edition ; 1936, Page. 48)

W. B. Yeats বলেন : Symbolism said things which could not be said so perfectly in any other way, and needed but a right instinct its understanding, which allegory said things which could be said as well or better, in another way and needed or right knowledge for its understanding. (Ideas of Good and Evil, London and Stratford-upon-Avon, 1914, First Edition : 1903, Page 158).

মনস্তত্ত্ববিদ C. G. Jung-এর মতে অপেক্ষাকৃত অজানা যে বিষয় স্পষ্টরূপে প্রকাশযোগ্য নয়, স্বাভাবিকভাবে তা প্রতীকধর্মিতা লাভ করে। অন্যদিকে পরিচিত বিষয়কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ছদ্মবেশ পরানো হলেও তা হয়ে ওঠে রূপক।

মঞ্জুশ্রী চৌধুরী বলেন: রূপক রচনা মূলত প্রকাশ-মাধ্যম। আর, সঙ্কেতের আবেদন গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে। সাংকেতিকতা মূলত চিন্তামাধ্যম। (রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ৯ মে ১৯৮৩ পৃ. ৬)

২ শওকত ওসমানের এই উপন্যাসগুলি রূপক কিনা-তা নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন: শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' প্রতীকাশ্রয়ী উপন্যাস। ...চরিত্রগুলি এক একটি চেতনার প্রতীক।... 'সমাগমে' শওকত ওসমান ফ্যান্টাসীর জগতে পদচারী। রাজা উপাখ্যান প্রতীকাশ্রয়ী হলেও গল্পরস প্রধান।... (বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ. ২৩)

মনসুর মুসা বলেন: ...'ক্রীতদাসের হাসি'কে হেঁয়ালী বলে অপাংক্তেয় গণ্য করা সহজ হবে না। এই অসংলগ্ন হেঁয়ালীর অন্য বিশ্লেষণ দেওয়া যায়। আধুনিক জীবন উপলব্ধির জটিলতা ক্রমে আমাদের জীবনের বিস্তৃত অঙ্গন ছেয়ে ফেলেছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক অগ্রগতি বিষমধারায় প্রবাহিত হচ্ছে; তাই জীবনসত্য উদ্‌ঘাটনে এখনো আমরা নগ্ন সত্যকে প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছিনে; বাধ্য হয়ে আমাদের গ্রহণ করতে হয় পলায়নী বৃত্তির সুযোগ। ...শওকত ওসমানের 'ক্রীত-দাসের হাসি' আমাদের জীবনেরই কোনো জটিলতর

সমস্যার প্রকাশ করেছে দূরাগত ঐতিহ্যের আশ্রয়ে। অতি-বাস্তবতায় এর সূচনা, রোম্যান্টিক স্পর্শের সজীবতায় এর বিকাশ এবং একটি স্বাপ্নিক পরিবেশে এর উত্তরণ।...

গভীর জীবন অনুধ্যানের ফল হিসেবে নয়, অনুসন্ধিৎসু শিল্পীর খেয়ালী শিল্পকর্ম হিসেবে 'সমাগম' উল্লেখযোগ্য।...

রাজা উপাখ্যান রূপকথাধর্মী রচনা হলেও তার সমস্যার আধুনিকতা ও সর্বজনীনতা পাঠকদের মনোযোগকে প্রতিমুহূর্তে নিবিষ্ট করে রাখে। (পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, পূর্ব লেখ প্রকাশনী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃ. ৫০-৫১, ৫৩, ৫৫)

৩ শওকত ওসমান।। ক্রীতদাসের হাসি, মুক্তধারা, ৭ম সংস্করণ, আগস্ট ১৯৮৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ. ২১

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১৪ শওকত ওসমান ।। সমাগম, কথাকলি, ঢাকা, ১১ই জৈষ্ঠ্য ১৩৭৪, পৃ. ১৪৫-৪৬

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-০৯

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

২৫ শওকত ওসমান ॥ রাজা উপাখ্যান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৭৭, পৃ. ১২৩

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৩১ শওকত ওসমান। পতঙ্গ পিঞ্জর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, মে ১৯৮৩, পৃ. ১১৭

৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-০৬

৩৫ সৈয়দ আকরম হোসেন "বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" গ্রন্থে বলেন: প্রশ্ন উঠবে, 'জননীর' বৃহৎ ক্যানভাস বাদ দিয়ে এ-পর্বে শওকত ওসমান কেন ইতিহাসের বিস্তৃতপ্রায় অধ্যায় থেকে ঘটনাংশ নির্মাণ করলেন ? কেনই বা তিনি পরিতৃপ্ত হলেন 'ফ্যান্টাসীর' উদ্ভট জগতে। এ-পর্বে শওকত ওসমানের কৃতিত্ব---তিনি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার সঙ্গে শিল্পভাবনাকে প্রগতিশীল ও সৃষ্টিমুখী রাখার জগৎ আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানে স্মরণযোগ্য, জাতীয় জীবনের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখনি 'There comes a moment of decision' এবং শিল্পীমানস either break through to socialism or founder in fatalism symbolism, mysticism and reaction. শওকত ওসমানের প্রতীকাশ্রয়ী মানস-চেতনার জন্ম---স্বকালসঙ্কট থেকে নিরাপত্তালাভের জন্যই। শওকত ওসমানের কৃতিত্ব তিনি তাঁর পলাতক চেতনাকে নিরীক্ষাধর্মী শিল্পরূপে উদ্ভাসিত করতে সমর্থ হয়েছেন। (পৃ. ২৩)

৩৬ মনসুর মুসা তাঁর "পূর্ব বাঙলার উপন্যাস" গ্রন্থে বলেন: চরিত্রগুলোতে ব্যাপ্তির চেয়ে তীক্ষ্ণতা, দ্বন্দ্বের চেয়ে গভীরতা, অভিজ্ঞতার চেয়ে উপলব্ধি অনেক বেশি। ...আরব্য রজনীর সেই দূরাগত পরিবেশকে প্রত্যক্ষ করে তোলার জন্য লেখক অজস্র আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরিবেশ-উপযোগী সার্থক ব্যবহারের জন্য শব্দগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত ও শক্তিশালী। ...'ক্রীতদাসের হাসি'র ভাষা বেগবান ও আকর্ষণীয়। (পৃ. ৫২)

...আঙ্গিক এবং বিষয় দুটোতে 'সমাগম' অভিনব এবং কৌতুকাবহ। বিভিন্ন চরিত্রের স্থানকাল এবং স্বভাবকে সুচিহ্নিত করার জন্য তাদের সংলাপেও এসেছে যুগোপযোগী এবং স্বভাবানুগ ভাষা।... (পৃ. ৫২-৫৩)

...ক্রীতদাসের হাসির অতিপল্লবিত কথাবিস্তার, বক্রবর্ণনার একঘেঁয়েমী ও কাহিনী সংগঠনের অসম্পূর্ণতা রাজা উপাখ্যানে একেবারেই নেই। শওকত ওসমান এ নিটোল কাহিনীকে বিশ্লেষণের গভীরতায়, শ্লেষের তীক্ষ্ণতায়, পরিমিতির সৌষম্যে একটি সার্থক শিল্পকর্ম করে তুলেছেন। তাঁর পরিচর্যা বুদ্ধি-দীপ্ত, বর্ণনা সংকেতধর্মী, ভাষা গতিশীল, অবেগময় ও বিষয়োপযুক্ত। 'রাজা উপাখ্যান' শুধু শওকত ওসমানের অন্যতম শিল্পকৃতি নয়, আমাদের উপন্যাস সাহিত্যেও বিশিষ্ট-তম শিল্পকর্ম।' (পৃ. ৫৫)

৩৭ শওকত ওসমান ॥ সমাগম, পৃ. ৭৬-৭৭

৩৮ শওকত ওসমান ॥ পতঙ্গ পিঞ্জর, পৃ. ৮১